দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 24 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম দুর্নীতির বিস্তার বহুদূর

নাজমা আরেফিন

প্রশাসনসহ সবাই যেভাবে নকলের আত্মবিধ্বংসী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা দেখে মনে হয় নকল করে পরীক্ষা দেয়া সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়েছে। এ পরিস্থিতি অবশ্য একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর সঙ্গে জড়িত আছে নানা রকম কাহিনী, বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের থানা পর্যায়ের কলেজগুলোর অবস্থা নাজুক। সে সব কলেজের শিক্ষকরা নাকি কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে পাহারা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের নকল করতে সাহায্য করেন। আর আমাদের অভিভাবকরা এতই নকল সচেতন যে, তারা তাদের সন্তানদের এসএসসি পাসের পর তথাকথিত ঐসব কলেজে ভর্তি করতে মোটেও ভুল করেন না। এসব অভিভাবক অবশ্য ছেলের জ্ঞানার্জনের চেয়ে স্কুল-কলেজ পাস করা সার্টিফিকেট পেলেই খুশি। অশিক্ষিত বাবা-মা হলে কথা নেই, কিন্তু শিক্ষিত বাবা-মার সন্তানটিও এ অপকর্ম থেকে বিরত নেই। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কর্মরত থেকে সন্তানটির জন্য নকলের সুযোগ হাতিয়ে নিতে মোটেও কার্পণ্য করেননি। জ্ঞানশূন্য সন্তানটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে লাভ কি? ভাবতে অবাক লাগে, কিভাবে সবাই আত্মঘাতী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার পর উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলে যায়। মেধা ও চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দু' বছরের পরিশ্রম শেষে এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। প্রত্যেকের যোগ্যতামতো ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত। কিন্তু পরীক্ষা ব্যবস্থাই যেখানে ভেঙ্গে পড়েছে, নকল করে ভাল রেজাল্ট বাগিয়ে নেয়ার দ্বার যেখানে উন্মুক্ত সেখানে যোগ্যতার প্রশ্নটি অবান্তর। যেভাবে হোক, পাস করাটাই মূল উদ্দেশ্য। সত্যিকার শিক্ষা যেন পাল্টে গেছে এবং এতে করে মেধাবী ছাত্রছাত্রী দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অসুস্থ পরিবেশে পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাদের মনের অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে একবার ভেবে দেখবেন কি? পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস এটা বহুদিনের পুরনো কথা, তবুও এর কোন প্রতিকার নেই। যেন বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে দেশ আজ জিম্মি হয়ে গেছে। বোর্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এ আগাছাগুলো পালা হয় কেন তা বোধগম্য নয়। এ আগাছাগুলো কেটে বাদ দিলে এমনকি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। দেশে কি কোন সৎ লোকজন নেই। যারা তাঁদের সততা ও নিষ্ঠা দিয়ে বোর্ডগুলোকে পরিচালিত করতে পারে? নাকি ওখানে জুজুর ভয় আছে। বর্তমান এসএসসি হতে ডিগ্রী পরীক্ষাসমূহে প্রায় প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল করে উত্তীর্ণ হাজার হাজার ডিগ্রীধারীর মেধা না থাকায় তারা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়ে বেকার জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে।

শোনা গেছে যে, 'লুকিয়ে লুকিয়ে লিখলে তাকে নকল বলা যেত, এ তো তা নয়'। কিছু দিন আগে এসএসসি'র ফল প্রকাশিত হয়েছে। সত্যিকারের মেধাবী ছাত্রছাত্রী আশানুরূপ রেজাল্ট করতে পারেনি। আবার যারা পাস করার কথা নয় তারা অনেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অনেক বিতর্কিত এইচএসসি পরীক্ষাও শেষ হয়েছে। যে পরীক্ষার নমুনা আমরা সংবাদপত্রে প্রতিনিয়ত দেখেছি যাতে, সমগ্র জাতিই আজ হতবাক। যেন কারও কিছু বলার নেই, করার নেই। এই পরীক্ষায় যে কত রকমভাবে নকলের উৎসব চলেছে তার হিসাব করা কঠিন। আর এ নকল করার প্রবণতা বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে একে শুধু গর্হিত কাজ হিসাবে অভিহিত করলে ভুল হবে। পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও এসব স্নাতক ডিগ্রীধারী সামান্য প্রাইমারী শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ করতে গৃহীত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে দেশ পরিণত হচ্ছে এক বেকারত্বের রাজ্যে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন বা পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন শুধু নয়, অবিলম্বে নকলের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করতে পারলে জাতি হিসাবে আমরা যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাব তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বর্তমানে বিসিএস পাস করা বিশ্বজয়ের মতো দুরূহ ব্যাপার। বিসিএস পরীক্ষা এমন একটি নির্বাচনী স্তর যার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের নিয়ামক শক্তি উদ্ভাবন করা হয়ে থাকে। যাঁরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন তারাই রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান নিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। কিন্তু এই বিসিএস-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাতে অবাধে নকল হচ্ছে। বিশেষ করে ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় যে নকলের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হয়েছে তা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। বিসিএস পরীক্ষায় শুধু অবাধে নকল হচ্ছে না, প্রশ্নপত্রে মারাত্মক ভুলও ধরা পড়েছে। এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার চালচিত্র যদি এমন হয় তবে নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায় যে, আমাদের সমাজের দেহে সর্বত্র পচন শুরু হয়েছে। এবারই যে প্রথম তা নয়, অতীতেও এ রকম জঘন্য কর্মকাণ্ড আরও হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে মেধাবী পরীক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। যে সব পরীক্ষার্থী অতীত পরীক্ষাগুলোতে নকল করে সার্টিফিকেট যোগাড় করেছে, তারাই আজ বিসিএস-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকেও কলুষিত করছে। শোনা গেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কঠোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। শুধু চিন্তাভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করে পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক। সত্যিকারের মেধাবীরা বেরিয়ে আসুক এ পঙ্কিল জগত থেকে। সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের নগ্নরূপকে এভাবে চলতে দেয়া ঠিক হবে না।

সম্প্রতি একটি দৈনিকে শিক্ষা সংক্রান্ত একটি ভয়াবহ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এভাবে জাতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়েছে, যে শিক্ষা একটি জাতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে, দেশকে উন্নত করতে পারে, দেশকে সর্বস্তরে এগিয়ে নিতে পারে সে শিক্ষার কাঁধে ভর করেছে অনিয়ম, দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারিতা। শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি এমন নৈরাজ্য বিরাজ করে তবে দেশের সামগ্রিক চিত্র কি হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকাশিত খবরে জানা যায়, এসএসসি পাসের ভুয়া মার্কশীট দাখিল করে দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের ৩৫০টি কলেজে ১৩০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার চাঞ্চল্যকর খবর। ভুয়া মার্কশীটধারীদের শনাক্ত করতে বোর্ডগুলো প্রথমবারে মতো এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এসব অপকর্মের সাথে কলেজ ও বোর্ড কর্মকর্তাদের একাংশ জড়িত বলে জানা যায়। মার্কশীট জালিয়াতিতে একটি সংঘবদ্ধ চক্র জড়িত থাকার প্রমাণও পাওয়া গেছে। জালিয়াতি এতটা ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বোর্ডের মনোগ্রাম সংবলিত রূপালী রঙের বিশেষ নিরাপত্তা স্টিকারও সূক্ষ্মভাবে জাল করা হয়েছে। এ কেলেঙ্কারি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এ ভুয়া মার্কশীটধারীরা যে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে না তা আমরা কিভাবে নিশ্চিত হই। এসব নেতিবাচক চিত্র যেখানে বিদ্যমান সেখানে আলো জ্বালানো দুরূহ ব্যাপার। কোনভাবে ভুললে চলবে না শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড যদি ভেঙ্গে যায় দেহ অচল হয়ে যাবে। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয় এসব রোধে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সর্বাগ্রে এ ক্ষতটি কলুষমুক্ত করতে না পারলে এ জাতির পঙ্গুত্ব স্থায়ী আকার ধারণ করবে।

গত ২ জুলাই ভোরের কাগজের একটি আবেদনপত্র পড়ে সত্যিই আমরা মর্মাহত। আবেদনপত্রটি ছিল শিক্ষামন্ত্রীর নিকট শেরপুর কলেজের অধ্যক্ষের। শেরপুর কলেজে ৮ জুন ইংরেজী ২য় পত্র পরীক্ষার সময় ঐ দিনের বহিষ্কৃত ৫টি ছেলে ও কিছু সন্ত্রাসী মিলে কলেজের প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার সম্পদ নষ্ট করে এবং শুধু নষ্ট করে তারা ক্ষান্ত হয়নি, বাকি ৯৫ জন পরীক্ষার্থীর ইংরেজী ২য় পত্রের খাতগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এ ৯৫ জন পরীক্ষার্থী বাকি পরীক্ষাগুলোয় অংশগ্রহণ করেছে। এক পেপার পরীক্ষার খাতা বোর্ডে জমা না পড়ায় তাদের জন্য পরীক্ষার ফলাফল অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে অনেকে গরিব বাবা-মার মেধাবী সন্তানও আছে। এবার হয়ত পাস না করতে পারলে অনেকের লেখাপড়া ইতি হয়ে যাবে। অধ্যক্ষ সাহেবের অনেক আবেদনের পরও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ৫টি বহিষ্কৃত সন্ত্রাসী ছেলের তাণ্ডবে নিভে যাবে ৯৫ জন পরীক্ষার্থীর এত দিনের স্বপ্নের প্রদীপ! আর বোধ হয় চুপ থাকা ঠিক হবে না। কর্তৃপক্ষ যত শীঘ্র সম্ভব এর একটা বিহিত করে এ ৯৫ জন পরীক্ষার্থীকে উদ্ধার করুন। অধ্যক্ষের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, ঐ কেন্দ্রের উক্ত পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নিয়ে জাতিকে এ দায় থেকে মুক্ত করুন।